সত্যজিতের বিনোদবিহারী (ইনার আই)

মৃণাল ঘোষ

স্যতজিৎ রায় পাঁচটি তথ্যচিত্র করেছিলেন। ১৯৭২-এ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে করা **ইনার আই** ওর মধ্যে তৃতীয়। তাঁর প্রথম ডকুমেন্টারি **রবীন্দ্রনাথ**। ১৯৬১ -তে তোলা। এর পর **সিকিম** ১৯৭১-এ। নৃত্যশিল্পী বালা স্বরস্বতীকে নিয়ে করেছিলেন **বালা** ১৯৭৬-এ। ১৯৮৭ -তে তোলা শেষ তথ্যচিত্র **সুকুমার রায়**। তিনি সেই ব্যক্তিত্বকে নিয়েই ছবি করতে উদ্বুদ্ধ হতেন যাঁর প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করতেন। বিনোদবিহারী সেই অল্পসংখ্যক ব্যক্তিত্বের অন্যতম। আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলায় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে তিনি শ্রেষ্ঠতম একজন শিল্পী বলে মনে করতেন।

তথাকথিত 'ওরিয়েন্টাল আর্ট' সম্পর্কে সত্যজিৎ একেবারেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। আগ্রহীও ছিলেন না খুব একটা। বিনোদবিহারীর ছবি দেখার পর তাঁর এ ধারণায় চিড় ধরেছিল। ১৯৪০ সালের আগে তিনি বিনোদবিহারীকে চিনতেন না। তাঁর ভাষায় 'তাঁর নামেও না কাজেও না।' বিনোদবিহারীর কাজের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে শান্তিনিকেতনে ছবি আঁকা শিখতে গিয়ে। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে তিনি একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলেন বিনোদবিহারী সম্বন্ধে। খুবই স্বচ্ছ, সংহত, বিদগ্ধ আলোচনা।। বেরিয়েছিল ১৯৭১ -এর দেশ, বিনোদন সংখ্যায়। পরে এটি 'বিষয় চলচ্চিত্র' বইতে সংকলিত হয়। এই লেখায় তিনি তাঁর প্রথম বিনোদবিহারীকে দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, শান্তিনিকেতনে প্রথম যেদিন ছাত্র হয়ে গেলেন সত্যজিৎ, সেদিনই কলাভবন হোস্টেলে বিনোদবিহারীর একটি ম্যুরাল দেখতে পান। সেটি ছিল বীরভূমের গ্রামের দৃশ্য। এই ছবি সম্পর্কে সত্যজিৎ ওই প্রবন্ধে লিখেছেন : 'এ ছবি এমনই ছবি, যার সম্বন্ধে ওরিয়েন্টাল আর্ট সম্পর্কে আমার মন - বিষোণ কোন সংজ্ঞাই প্রয়োগ করা চলে না।'

কাজেই নব্য - ভারতীয় ঘরানার ধারাবাহিকতায় সত্যজিৎ বিনোদবিহারীকে নতুন মূল্যবোধের স্রষ্টা হিসেবে আবিষ্কার করলেন। ১৯৫০ সালে তিনি বিনোদবিহারীর হিন্দিভবনে মধ্যযুগের সন্তদের নিয়ে করা ম্যুরালটি দেখেন। এটি রচিত হয়েছিল ১৯৪৬ - ৪৭ সালে। এটি সম্পর্কে পুর্বোক্ত নিবন্ধে সত্যজিতের মন্তব্য ছিল : 'বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের দেশে এর চেয়ে মহৎ ও সার্থক কোনও শিল্পকীর্তি রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।' তাঁর এই মত নিয়ে কেউ হয়তো তর্ক করতে পারেন। অবনীন্দ্রনাথের 'আরব্য রজনী চিত্রমালা', 'কৃষ্ণমঙ্গল' চিত্রমালা, গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, রামকিংকর -এর ভাস্কর্য ও ছবি সত্ত্বেও এই মন্তব্য কতটা সার্বিক সত্য, এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন কেউ। তবু এই মন্তব্য থেকে সত্যজিতের নিজস্ব শিল্পদৃষ্টির কিছু ইঙ্গিত আমরা পাই। আধুনিক ভারতীয় চিত্রের কাছে তাঁর যে প্রত্যাশা বিনোদবিহারীর ছবিতে তিনি তা পেয়েছেন। এই অনন্যতাই তাঁকে বিনোদবিহারী সম্পর্কে আগ্রহী করেছে।

শুধু ছবির উৎকর্ষ নয়, আরও একটি কারণ সত্যজিৎকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। জন্ম থেকেই বিনোদবিহারীর একটি চোখে দৃষ্টি ছিল না। অন্য চোখটিও ছিল খুবই ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন। সেটুই দৃষ্টিও তিনি হারিয়ে ফেলেন ১৯৫৬ সালে চোখে একটি অস্ত্রোপচারের পর। এরপর ১৯৮০ - তে মৃত্যুর আগে তিনি আরও ২৪ বছর বেঁচে ছিলেন। দৃষ্টিহীনতা তাঁকে শিল্পসৃষ্টি থেকে বিরত করতে পারেনি। শুধু তাঁর প্রকাশের ধরন পাল্টেছিল। দৃষ্টিহীনতা তাঁকে নতুন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল। সেই অন্তর্দৃষ্টি বা 'ইনার আই' -কেই সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে মূল বিষয় বা উপজীব্য করে তুলতে চেয়েছেন। সেজন্যই ছবির নাম ইনার আই।

বিনোদবিহারীর ঐতিহ্যসম্পৃক্ততা বা রুটেডনেস সত্যজিৎকে তাঁর শিল্পের প্রতি আগ্রহী করেছিল। সাধারণভাবে বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলাকে তাঁর মনে হয়েছিল খুবই 'ডেরিভেটিভ'। এর ব্যতিক্রম তিনি যে দু-একজনের মধ্যে দেখেছিলেন, সুব্রামনিয়ন তাঁদের একজন। একথা তিনি বলেছিলেন অ্যান্ড্রু রবিনসনকে। রবিনসন তাঁর 'সত্যজিৎ রায় : ইনার আই' বইতে তাঁর এই মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। সত্যজিৎ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন — 'I have grown less and less interested in painting over the years somehow. But Binodeda was very deeply rooted' (পৃ. ২৮২)। পাশ্চাত্য, জাপান এবং ভারতীয় ঐতিহ্য - এই তিন উৎস থেকে তিনি যা কিছু পেয়েছিলেন তাকে তিনি প্রকৃষ্টভাবে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছবি দেখে উৎসগুলিকে আর আলাদা করে শনাক্ত করা যায় না। অন্য অনেকের ছবিতে যে সমস্যাটা থাকে। বোঝা যায় এটা এখান থেকে নেওয়া, অন্যটা অন্য এক জায়গা থেকে। প্রকৃষ্ট সমন্বয়ের অভাব থেকে যায়। বিনোদবিহারী এদিক থেকে ব্যতিক্রমী। সত্যজিৎ তাই মনে করেন। 'It's a reflection of his own personality and his ablity to get out of all the elements and make a whole.'

এই যে সিনথেসিজ বা অ্যাসিমিলেশনের কথা বলেছেন সত্যজিৎ, এই বৈশিষ্ট্য বিংশ শতকে আর কোনও ভারতীয় শিল্পীর মধ্যে ছিল না, একথা সর্বাংশে সত্য নয়। আমরা আগে যে কয়েকজন শিল্পীর উল্লেখ করেছি, তাঁদের সকলেই এই একই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সত্যজিতেরও তা না অনুভব করার কথা নয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনে শিক্ষানবিশির সময় বিনোদবিহারী তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন তাঁর পাণ্ডিত্য, অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব ও শিল্পচেতনার সংহতিতে যেমন, তেমনি ১৯৭৩ -এ মারি সিটনকে যে কথা বলেছিলেন সত্যজিৎ তেমনি

তাঁর 'total lack of flamboyance'- এর জন্য ও।

শিল্পদৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের এই সংহতি এবং দৃষ্টিহীনতাজনিত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি –এই গুণাবলীর জন্যই সত্যজিৎ বিনোদবিহারীকে নিয়ে ছবি করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। 'ইনার আই' তাঁর এই নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দু হলেও বিনোদবিহারীর সমগ্র জীবন ও শিল্পবিকাশই হয়ে উঠেছে সত্যজিতের ছবির বিষয়। অত্যন্ত পরিমিত ভাষায়, সময়ের সরলরৈখিক ধারাবাহিকতায় না গিয়ে, বিভিন্ন কালপর্বকে সামনে পিছনে করে, বিনোদবিহারীর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পবিকাশকে পরিস্ফুট করেছেন সত্যজিৎ। এতটাই বিদগ্ধভাবে যে এই ছবি ভারতীয় তথ্যচিত্রের ইতিহাসে শিল্পবদ্ধ সুঠাম নির্মাণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

ছবি শুরু হয় দৃষ্টিহীন বিনোদবিহারী মেঝেতে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে তুলি দিয়ে ছবি আঁকছেন এই দৃশ্য দিয়ে। এই দৃশ্যের উপর ভেসে ওঠে ছবির নাম ইনার আই। ক্রেডিট টাইটেলের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে থাকি বিনোদবিহারীর একের পর এক ছবি। নাম প্রক্ষেপণ শেষ হলে পর্দায় ভেসে ওঠে দেয়ালের ওপর সাঁটা কাগজের বড় বড় কাট-আউট। এর উপরই ধ্বনিত হয় নেপথ্য ভাষণ, সত্যজিতের নিজের কণ্ঠে' Familiar types familiar gestures. Strong subtle silhouetes with validity of timeless symbols. These figures have been cut out of rapping papers. There are 20 of them in all arranged in a rhythmic sequence to form a panel 5ft high 60 ft. wide. These serve as a plan for decoration of a new building in Santiniketan. এর পরই আমরা নেপথ্য ভাষণ থেকে জানতে পারি এই ম্যুরালের পরিকল্পনা করেছেন বিনোদবিহারী মুখার্জি। তিনি দৃষ্টিহীন একজন শিল্পী। আপাত - দৃষ্টিহীনতা কীভাবে অন্তর্দৃষ্টি জাগিয়ে তালে তারই দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু হয়েছে এই তথ্যচিত্র।

১৯৭১ সালে শান্তিনিকেতনে বিনোদবিহারী যখন তৈরি করছিলেন এই ম্যুরাল, তখনই তোলা হয় এই ছবি। এই কাগজের কাট-আউটগুলো সরিয়ে পরে এর উপর বসবে সিরামিক টাউলস। পুরুলিয়া থেকে তৈরি হয়ে পর পর নম্বর দিয়ে প্যাকেটবন্দী হয়ে এসেছে এই টাইলস। সেগুলো খুলে পরপর সাজানো উপর যখন লাগানো হচ্ছে টালিগুলো, সহকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বিনোদবিহারী বলেন, 'This is the first time the form and space have been a blind man's space.' সেই দৃষ্টিহীনের পরিসরকে কীভাবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুবীক্ষণ করতে হয় সেটাই সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেন শিল্পী। স্পেস বা পরিসরের যে স্বতন্ত্র মাত্রা আবিষ্কার করেছেন শিল্পী, সেই মাত্রার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে করতেই সত্যজিৎ দর্শককে এই শিল্পীর নিজস্ব ভুবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চারিত এই সৃজননের জগৎ থেকে এরপর সরে আসে ক্যামেরা। বিনোদবিহারীকে ধরে শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের ঘরে। কালো চশমা পরা শিল্পী হাত বাড়িয়ে দরজা অনুভব করে ঘরে প্রবেশ করেন। চেয়ারে বসেন। টেবিলের তলায় ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে রাখা চায়ের ফ্লাস্কটি তুলে নেন। কাপে চা ঢালেন। আগেই নেপথ্য কণ্ঠে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে জন্ম থেকেই তাঁর এক চোখে দৃষ্টি ছিল না। আর এক চোখ ছিল 'মায়োপিক'। সেই দৃষ্টিটুকুও হারিয়ে যায় ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৮ -তে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন শিল্প - ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে।

ক্যামেরা ফিরে যায় তাঁর শৈশবে। একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের উপর স্থির হয়। তিন ভাইকে দেখা যায়, মোটা বই হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের শিশুটি বিনোদবিহারী। আর একটি ফোটোগ্রাফে তাঁদের যৌথ পরিবারের সকলকে একসঙ্গে দেখা যায়। জানানো হয় ছ'ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ বিনোদবিহারী। দৃষ্টির ক্ষীণতার জন্য শৈশবে তাঁর পড়াশুনো বাধাপ্রাপ্ত হয়। পারিবারিক পরিবেশে পড়াশুনোর আগ্রহ ছিল। বিনোদবিহারীও বই পড়তে ভালবাসতেন খুব। তাঁর সব ভাইয়েরই ছিল আঁকার দিকে ঝোঁক। তাঁর প্রথম জীবনে আঁকা কিছু নিসর্গের ড্রয়িং দেখানো হয় এর পর। ১৫ বছর বয়সে তাঁকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয়। পাঠভবনে ভর্তি হন প্রথমে। ক্যামেরা শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডলকে ধরে। ওখানকার চালাঘরের স্থাপত্য। প্রান্তরে গাছের তলায় ক্লাস নেওয়ার দৃশ্য।

পাঠভবনে তিন বছর পড়ে বিনোদবিহারী কলাভবনে যোগ দেন। ক্যামেরা ধরে নন্দলাল বসুকে। নন্দলাল দ্রুত হাতে আঁকছেন একটি গাছের ছবি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ধরা পড়েন না ক্যামেরায়। কিন্তু বিনোদবিহারীর কলাভবনে ভর্তি হওয়ার পিছনে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আমরা দেখি কলাভবনে ক্লাস হচ্ছে। তারপরেই ক্যামেরা চলে যায় শান্তিনিকেতনের নিসর্গে। আবহে দোতারার সুর বাজে। বিস্তীর্ণ খোয়াইয়ের দৃশ্য ভেসে ওঠে। সেই খোয়াইএর ভিতর নিঃসঙ্গ একটি তালগাছ।

বিনোদবিহারী নিবিড়ভাবে চেয়েছিলেন যেন সত্যজিতের ছবিতে খোয়াইয়ের দৃশ্য থাকে। বলেছিলেন, 'খোয়াই বাদ দিও না। খোয়াই, আর তাতে একটি সলিটারি তালগাছ। ব্যাস। আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয়, ওতেই পাবে। বলতে পার - ওটাই আমি।' (সত্যজিৎ - পূর্বোক্ত প্রবন্ধ 'বিষয় চলচ্চিত্র' পৃ. ১২৩)। এই খোয়াই আর শান্তিনিকেতনের নিসর্গের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ক্যামেরা যখন বিনোদবিহারীর নিসর্গের ছবির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন এই দুইয়ের একাত্মতা অনুভব করি আমরা। বিনোদবিহারীর চেতনার নিসর্গকে এভাবেই উন্মীলিত করেন সত্যজিৎ।

তবু শান্তিনিকেতনের সৃজন-আবহের যে পরিপূর্ণতা বিনোদবিহারীকে ঘিরে, তার কোনও রূপরেখা এই ছবিতে আসে না। একবারও উচ্চারিত হয় না রামকিংকরের নাম। 'সলিটারি তালগাছ' -এর মতোই একক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন বিনোদবিহারী। তাঁর প্রথম দিকের কাজের ধারা প্রবাহিত হয়। পশু ও পাখির ছোট ছোট স্কেচগুলো অনবদ্য। আবহে বয়ে যায় বাঁশি ও দোতারার ছন্দিত সুরের

স্নিগ্ধ ঢেউ। তাঁর 'লাফটার' ছবিটি (১৯২১) ভেসে ওঠে পর্দায়। সূর্যাস্তের রঙিন আলোয় আন্দোলিত শুভ্র কাশফুল। এই ছবির উপরই জানানো হয় আমাদের তাঁর প্রথম পর্বের ছবিতে নন্দলালের প্রভাবের কথা। কিন্তু এই বিশেষ ছবিটিতে তো সেভাবে নেই নন্দলাল। এর পরের দুটি ছবি ১৯৩২ -এর 'দ্য ট্রি লাভার' ও 'দ্য ব্রিজ'। বিনোদবিহারীর অন্তর্মুখী গভীর অন্বেষণের শুরু এখান থেকে। একক তালগাছের উপমার যথার্থতা অনুধাবন করতে থাকি আমরা।

১৯৩৭ -এ বিনোদবিহারী জাপান যান। সেখানকার শিল্পের গভীরে প্রবেশ করেন। এক নতুন পর্ব শুরু হয় তাঁর শিল্পীজীবনে। জাপানে তিনি আকৃষ্ট হন সোতাৎসু ও দ্বাদশ শতকের টোবা সোচো-র তুলিচালনার সূক্ষ্ম ও ছন্দিত নৈপুণ্যের প্রতি। এই যাত্রায় তিনি চিনেও গিয়েছিলেন। কিন্তু সেকথা উল্লিখিত হয়নি এই তথ্যচিত্রে। জাপান থেকে ফিরে আসার পর তিনি দায়িত্ব পান কলাভবনের নতুন ডর্মিটারিতে একটি ভিত্তিচিত্র আঁকার জন্য। টেম্পারায় আঁকা হয়েছিল সেটি ১৯৪২ সালে। এক টুকরো মিশরীয় ফ্রেসকো দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। তাতে ছিল একটি পুকুরকে ঘিরে কিছু গাছের ছবি। বিনোদবিহারীর ছবিতেও এল সেই পুকুর। চারপাশে গাছের পরিবর্তে এল তাঁর দেখা বীরভূমের সমগ্র জীবনপ্রবাহ। দু-বছর পরে চিনা ভবনে তিনি আঁকলেন তাঁর দ্বিতীয় ফ্রেসকো। বিষয় উঠে এল কলাভবনের ক্যাম্পাস থেকে। আলম্ব দীর্ঘায়ত জটিল রচনাবন্ধে এখানে পরিস্ফুট হল তাঁর চিত্রচেতনার অন্তর্মুখী নিভৃত এক দিক।

ক্যাম্পাসের ফ্রেসকোর শেষ শটের উপরই কাট করে ভেসে ওঠে বেনারসের গঙ্গাতীরের দৃশ্য। সত্যজিতের প্রিয় বেনারস। বিনোদবিহারীরও। স্বল্পকালীন বেনারস ভ্রমণ তাঁর ছবির আঙ্গিকে নতুন ছন্দ নিয়ে আসে। নেপথ্যভাষ্যে শুনি আমরা বিনোদবিহারী তখন সবেমাত্র চল্লিশ অতিক্রম করেছেন, এর মধ্যেই তিনি পৌঁছেছেন তাঁর সৃজন - স্বাতন্ত্র্যের শীর্ষে। তাঁর ক্যালিগ্রাফি নৈপুণ্যের কথা বলা হয় এখানে। দেখানো হয় সেই নিজস্ব লিখন পদ্ধতিতে করা কিছু বইয়ের প্রচ্ছদ -'পথে বিপথে', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' ইত্যাদি।

এর পরই আসে ১৯৪৬-৪৭ সালে করা তাঁর হিন্দিভবনের 'মধ্যযুগের সন্তরা' ভিত্তিচিত্রের প্রসঙ্গ। একে সত্যজিৎ বলেছেন বিনোদবিহারীর মধ্যপর্বের শ্রেষ্ঠ অবদান। এই ভিত্তিচিত্রের তাৎপর্য সম্বন্ধে নেপথ্য - ভাষণ চলে যখন আবহে কোনও ধ্বনি থাকে না। আবহধ্বনি শুরু হয় যখন ভিত্তিচিত্রের বিভিন্ন অংশের উপর দিয়ে ক্যামেরা প্রবাহিত হয়। নেপথ্যভাষণে সত্যজিৎ বলেন, 'Beyond the examples of a truly epic conception of twentieth century Indian art the fresco occupies the three walls of Central hall.' এর আঙ্গিক বা শৈল্পিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিনোদবিহারীর কণ্ঠে শোনা যায় : 'বেসিক জিনিসটা আমার কাছে প্রি-রেনেসাঁস বলে মনে হয়েছে। বাইজান্টাইন, জৈন, পট, পাটা -এ তোমার হিস্টোরিয়ানের কাছে অনেক তফাৎ থাকতে পারে। কিন্তু তোমার আমার আস্টিস্ট - এর কাছে কী তফাৎ আছে। জৈনর পাশে ফোক ফিগার দিলে কার বাবার সাধ্য আছে ধরে?' শুধু আঙ্গিকের অভিনবত্ব নয়, এই ভিত্তিচিত্রের মধ্য দিয়ে এক গভীর বাণী প্রকাশ করেছেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক সংঘাতে পর্যুদস্ত দেশবাসীর কাছে তিনি সমন্বয় ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

এর পরেই মন্দিরে ঘন্টা বেজে ওঠে। একটি প্রত্ন - মূর্তির উপর ক্যামেরা জুম করে পিছিয়ে আসে। ভেসে ওঠে নেপালের মন্দিরভাস্কর্য। ১৯৪৯ সালে বিনোদবিহারী নেপাল গিয়েছেন ওখানকার জাতীয় সংগ্রহশালায় কিউরেটর হয়ে। এখানে কাজ করতে করতেই তিনি উপলব্ধি করেন ফাইন আর্ট আর হ্যান্ডিক্রাফটের মধ্যে নান্দনিকভাবে কোনও পার্থক্য নেই। নেপালে আঁকা ছবিগুলো যখন পর্দায় ভেসে উঠেছে, তখন নেপথ্যে বাজছে তারসানাইয়ের সুর। রাজস্থানের বনস্থলী বিদ্যাপীঠে তিনি নেপালের অভিজ্ঞতা থেকেই ভিত্তিচিত্র আঁকেন। ১৯৫৩ সালে তিনি মুসৌরিতে শুরু করেন তাঁর নিজের স্কুল। নেপালের অভিজ্ঞতা সেখানকার শিক্ষাধারায়ও কাজে লাগে। মুসৌরিতে তিনি আঁকেন হিমালয়ের কিছু নিসর্গদৃশ্য যেখানে ধরা পড়ে প্রকৃতির ক্রমপরিবর্তমান পরিস্থিতি। এভাবে ফ্লিটিং নেচার তিনি আগে কখনও আঁকেননি।

১৯৫৬-তে চোখে এক বিফল অস্ত্রোপচারে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান সম্পূর্ণভাবে। পর্দা অন্ধকার হয়ে যায়। মন্দিরের ঘন্টা বাজে। নেপথ্যভাষণে বলা হয় তাঁর অন্তর্দৃষ্টির কথা। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে আশাবরী বাজতে থাকে। ব্যর্থতা নয়, হতাশা নয়, সম্ভাবনায় দীপ্ত নতুন এক জীবন। কালো চশমা পরা বিনোদবিহারী একের পর এক এঁকে যেতে থাকেন ছন্দিত রেখায় অসামান্য ছবি। আঙুলের চালে গড়তে থাকেন ভাস্কর্য। রঙিন কাগজের কাট - আউটে গড়ে উঠতে থাকে প্রতিমাকল্প। এই সুরের ভিতর দিয়েই পর্দায় ভেসে ওঠে দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে তাঁর নতুন অনুভবের কথা 'Blindness is a new feeling/a new experience/a new state of being.'

কুড়ি মিনিট দৈর্ঘ্যের এই তথ্যচিত্রে সত্যজিৎ বিনোদবিহারীর এই অন্তর্দৃষ্টিকেই করে তোলেন প্রধান বিষয়। সেই সূত্রে শিল্পীর সমগ্র জীবনের ও শিল্পীসত্তার হয়ে ওঠাকেও নির্মাণ করেন। আর প্রকাশ করেন বিংশ শতকে ভারতে চিত্রকলার বিকাশ সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা (Critique)। ওরিয়েন্টাল আর্টের সীমাবদ্ধতাগুলিকে চিহ্নিত করেন। বিনোদবিহারী সেই সীমাবদ্ধতাকে কেমন করে অতিক্রম করেছেন সেটাও পরিস্ফুট করেন। ভারতীয় চিত্রকলার আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর মত সকলে সমর্থন নাও করতে পারেন। তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু পরিমিত ভাষায় সুঠাম গঠনে সত্যজিৎ যেভাবে পরতে পরতে গড়ে তুলেছেন এই তথ্যচিত্র, নান্দনিক উৎকর্ষে তা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।